এক জন্ম-মনঃসমীক্ষকের জীবন-কথা

মীরাতুন নাহার

কথামুখ

সিগমুন্ড ফ্রয়েড (SIGMUND FREUD) জীবনী লেখা নামক ব্যাপারটিকে একটুও পছন্দ করতেন না, তা সে যে-কারও জীবনী হোক। তিনি তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি নিজের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নষ্ট করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন, "Whoever turns biographer commits himself to lies, to concealment, to hypocrisy, to embellishments, and even to dissembling his own lack of understanding, for biographical truth is not to be had, and, even if one had it, one could not use it."[১] যে মানুষটি এমন বিশ্বাস করতেন যে, জীবনী লিখতে হলে মিথ্যাকথন, গোপনীয়তা, ভণ্ডামি ইত্যাদিকে অবলম্বন করতে হয় কেননা জীবনসম্পর্কিত সত্য অনুসন্ধানে মেলে না এবং মিললেও তা ব্যবহার করা যায় না, তাঁর জীবনবৃত্তান্ত লিখতে বসে কলম চলতে চায় না। তবুও বর্তমান নিবন্ধে, তাঁর গভীর অবিশ্বাসকে মান্যতা দিয়েই, তাঁর জীবনের কিছু ঘটনাবলি উপস্থাপন করা হল এবং সেইসঙ্গে সে সবের সমর্থনে তাঁর নিজের ও তাঁর অনুগামীদের কিছু উল্লেখযোগ্য উক্তি। যে মানুষটি তাঁর লেখনক্ষমতা এবং ভাবনার প্রশস্ততা ও দুঃসাহসিকতার দ্বারা একটি গোটা যুগের চিন্তা, জীবন এবং কল্পনায় বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে তাঁর জীবনের বাহ্যিক ঘটনাবলিতে খুঁজতে চাওয়া পণ্ডশ্রম আমরা জানি, তবুও তাঁকে সেভাবে জানাও যে আবশ্যক তা আমরা মানি। Freud হলেন এমন একজন মানুষ যিনি সমগ্র মানবমণ্ডলীকে তাদের ক্ষুধা, বৌদ্ধিক শক্তি, আত্মজ্ঞান, আত্মপ্রতারণা, জীবনের লক্ষ্য, তীব্রতম আসক্তি, গভীরতম অথবা তুচ্ছতম ব্যর্থতা প্রভৃতি সম্পর্কে এমনভাবে ভাবতে প্ররোচিত করেছিলেন যা তাঁর পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছে চূড়ান্ত অশালীন এবং নির্বুদ্ধিতা প্রকাশক বলে গণ্য হয়েছিল। তিনি একই সঙ্গে বিদ্বজ্জন এবং সাধারণ মানুষদের মানব-অস্তিত্ব ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত নানাবিধ প্রচলিত মতগুলির বিরোধিতা করেছিলেন এবং কোন কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি সারা বিশ্বের চিন্তাজগতে এতখানি আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন যার তুলনা মেলে না। তাঁর জীবনেতিহাস আদ্যন্ত জয়ের। সেই বিজয়ী জীবনের কিছু বৃত্তান্ত এখানে তুলে ধরা হল।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির একটি ক্ষুদ্র শহর ছিল যখন মোরাভিয়া তখন তার অন্তর্গত ফ্রাইবার্গ নামক একটি ছোট্ট শহরে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৬মে একটি মধ্যবিত্ত ইহুদি পরিবারে একটি শিশুর জন্ম হয় প্রথমে যার ইহুদীয় নাম রাখা হয় শ্লোমস্ (Schlomes)। তারপর তার নাম দেওয়া হয় সিজিসমুন্ড ফ্রয়েড (Sigismund Freud) যেটি পরে তাঁর যৌবন বয়সে পরিবর্তিত হয় এবং তাঁর নাম হয় সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) যে নামে তিনি বিশ্ব-খ্যাতি অর্জন করেন। বিশ্ব-মনোবিজ্ঞানের জগতে তোলপাড় তুলে তিনি বিশ্ব-বরেণ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

তাঁর জন্মদাতা হলেন জেকব ফ্রয়েড (Jacob Freud) এবং মায়ের নাম অ্যামেলিয়া নেথান্সন (Amalia Nathansohn) যিনি সুন্দরী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তরুণী এবং তাঁর স্বামীর থেকে বয়সে কুড়ি বছরের ছোট ছিলেন। জেকব (Jacob)-এর তৃতীয় স্ত্রী অ্যামেলিয়া (Amalia) তাঁর স্বামীর প্রথম স্ত্রীর দুটি পুত্রসন্তানের সমবয়সী ছিলেন। তাঁর পিতার চল্লিশ বছর বয়সে ফ্রয়েডের (Freud) জন্ম হয় এবং তাঁর দুই বৈমাত্রেয় অগ্রজ ইম্যানুয়েল (Emmanuel) ও ফিলিপ (Philipp) তাঁর থেকে কুড়ি বছরের বেশি বয়সি ছিলেন। ফিলিপের (Philipp)-এর পুত্র জন (John)-এর সঙ্গে ফ্রয়েড (Freud) খেলা করতেন, যে তাঁর থেকে এক বছরের বড় ছিল এবং তাদের উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক বজায় ছিল। ফ্রয়েডের (Freud) জন্মদাত্রী মোট আটটি সন্তানের জননী হয়েছিলেন। ফ্রয়েড (Freud) তাঁর ভাইবোনদের প্রতি ঈর্ষার মনোভাব পোষণ করতেন জানা যায়, যদিও তিনি ছিলেন তাঁর মায়ের প্রথম সন্তান। সকল শিশুর মধ্যেই যে স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা লক্ষ করা যায় শিশু ফ্রয়েডের (Freud) মধ্যে তা অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয় এবং সমগ্র জীবনে তা মেটানোর যথেষ্ট সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

তাঁর পিতা পশমের ব্যবসা করতেন। ফ্রয়েড (Freud) যখন জন্মান তখন তাঁর পিতার এই ব্যবসায় অবনতি ঘটে এবং তাঁর বয়স যখন মাত্র চার বছর অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পিতা সপরিবারে ভিয়েনা শহরে বাসস্থান বদল করেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ফ্রয়েড (Freud) তাঁর শৈশবে অর্থাভাবের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তবে তাঁর পিতা সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন, বিশেষত ফ্রয়েডের (Freud) প্রতি কেননা শৈশবেই বোঝা গিয়েছিল যে, তাঁর এই সন্তানটি প্রখর মেধা ও বুদ্ধির অধিকারী। স্কুল জীবনের শুরু থেকেই ফ্রয়েড (Freud)-এর প্রতিভার স্ফূরণ লক্ষ করা গিয়েছিল এবং সেকেন্ডারি স্কুলে থাকাকালে বছরের পর বছর তিনি প্রথম স্থানাধিকারী হওয়ার গৌরব লাভ করেন। ভিয়েনার সেকেন্ডারি স্কুল 'গিমনাজিয়াম (gymnasium) ছিল এমন শিক্ষালয় যেখানে শুধুমাত্র অতিশয় মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাই শিক্ষালাভের সুযোগ পেত এবং এই স্কুল থেকে পাশ করার পর তারা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেত। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ন'বছর বয়সে ফ্রয়েড ভিয়েনার এই স্কুলে ভর্তি হতে পারেন এবং স্কুলের প্রথা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণের

উপযোগী সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে যখন পাশ করে বের হন তখন কোনো বিশেষ জীবিকা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা তিনি পাননি। ঐ একই বছরে মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন ডাক্তারি পড়ার জন্য। তবে চিকিৎসক হওয়ার জন্য এই বিষয়ে পড়াশুনা করার সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেননি। অভিভাবক হিসেবে তাঁর জন্মদাতাও তাঁকে জীবিকা বেছে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর নিজের ঝোঁককেই গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ফলে স্কুলজীবনের এক সিনিয়র সহপাঠীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আইনবিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে সামাজিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করবেন, এমন ইচ্ছে মনে মনে তিনি পোষণ করেন। ডারউইনের তত্ত্বও সেসময়ে তাঁকে, জগতকে জানার তাড়নায়, যথেষ্ট আকৃষ্ট করে এবং স্কুলের পড়াশুনো শেষ হওয়ার আগে একদিন এক অধ্যাপকের কাছ থেকে প্রকৃতি (Nature) -বিষয়ক একটি প্রবন্ধ-পাঠ শুনবার পর তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে পাঠগ্রহণ করবেন, স্থির করেন। অথচ চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার কোনো ইচ্ছাই তাঁর মনে কখনও জাগেনি। তিনি বরং দার্শনিক বা বিজ্ঞানীদের মতো মানবজীবন বিষয়ক বিবিধ অনুসন্ধান কর্মাদিতে অধিকতর আকর্ষণ বোধ করেছেন ছোটবয়স থেকেই। তাঁর নিজের কথায়, "... my father insisted that, in my choice of a profession, I should follow my own inclinations. Neither at that time, nor indeed in my later life, did I feel any particular predilection for the career of a physician. I was moved, rather by a sort of curiosity, which was, however, directed more towards human concerns than towards natural objects..."[২] অতঃপর তিনি ফিজিওলজি এবং নিউরোলজি বিষয়ে এতখানি মনোনিবেশ করেন যে, ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তাঁর 'ডক্টর অফ মেডিসিন' ডিগ্রি অর্জন করতে পারেননি। ডিগ্রিটি পেতে এত দেরি হওয়ার কারণ তিনি নিজেই জানিয়েছেন—'I was decidedly negligent in pursuing my medical studies'.[৩] এইপ্রকার অবহেলার কারণও তিনি দর্শিয়েছেন তাঁর আত্মজীবনীর পাঠকদের—'The various branches of medicine proper, apart from psychiatry, had no attraction for me.'[৪] তিনি ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে পঁচিশ বছর বয়সে ডাক্তারি পাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হওয়ার পরপরই কিছু অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে সাময়িক হতাশা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। জন্মপরিচয়সূত্রে তিনি ইহুদি বলে নিজেকে খাটো এবং বহিরাগত হিসেবে গণ্য করবেন এমনটাই যেন স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিল সেই শিক্ষাঙ্গনের অধিকাংশ জন। ফ্রয়েড এই দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নিতে পারেননি প্রথম থেকেই এবং তার ফলস্বরূপ একজন স্বাধীন মতাবলম্বী মানুষ হয়ে ওঠার ভিত্তি তখনই গড়া হয়ে যায় তাঁর জীবনে।

১৮৭৬ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত তিনি ভিয়েনার 'Institute of Physiology'-র গবেষণাগারে অধ্যাপক Ernst Brücke-এর অধীনে গবেষণার কাজে যোগ দেন এবং Central Nervous System এর গঠনতন্ত্র সম্পর্কে গবেষণা করে তার ফলাফল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে সফল হন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রদ্ধা করার এবং আদর্শ

ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করার মতো কয়েকজন গুণীজনকে পেয়ে তিনি মনের গ্লানি দূর করে পূর্ণ আত্মতৃপ্তি বোধ করেন। এখানে ছয় বছর ধরে গবেষণা করার সময়কালে তিনি Brüke এর প্রভূত আস্থা অর্জন করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানেই উচ্চপদে আসীন হবেন শীঘ্র, এমনটি সকলে ভাবতে থাকেন। পাশাপাশি অবশ্যই মেডিকেল ছাত্র হিসেবে তাঁর অধ্যয়নকর্ম এবং ডিগ্রি অর্জন বিঘ্নিত ও বিলম্বিত হতে থাকে। কিন্তু Brücke তাঁকে এই সময়ে এতখানি প্রভাবিত করেছিলেন যে, এই ক্ষতি তাঁকে বিড়ম্বিত করতে পারেনি। পিতৃসম এই মানুষটি সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "the greatest authority that worked upon me."[৫] অতঃপর তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিটি লাভ করেন, দেরিতে হলেও এবং পরম শ্রদ্ধাভাজন এই শিক্ষকেরই পরামর্শে গবেষণাকর্ম ছেড়ে ভিয়েনা জেনেরাল হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসক হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন।

প্রেম-পরিণয়-কর্মজীবন

ব্রুকের কথামতো ফ্রয়েড গবেষণাগারের কাজ ছেড়ে চাকরিতে যোগ দিলেন। মূলত তাঁর পিতৃ পরিবারের আর্থিক দৈন্যদশা দূর করা নামক কর্তব্যবোধের তাড়নায়। কিন্তু কাহিনির সেটি খণ্ড অংশ মাত্র কেননা, পরিবারের অর্থাভাব এর আগে কখনও তাঁকে এমনভাবে ভাবায়নি। অতএব এইপ্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মূলে যুক্ত হয়েছিল আরেকটি হেতু এবং সেটি হল তাঁর প্রেম। সেই প্রেমকে পরিণয়ে রূপ দিতে হলে চাই আর্থিক স্বনির্ভরতা—এই সত্য তিনি সম্যক উপলব্ধি করলেন এবং অংশত সেকারণে তাঁর "greed for knowledge"-কে সেসময় সাময়িকভাবে হলেও সংবরণ করে নিজেকে জীবিকামুখী করে তুললেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে ফ্রয়েড প্রথম মার্থা বার্নেস (Marthe Bernays) কে দেখেন এবং তিনি বুঝতে পারেন নিজের অন্তরের চাওয়াকে। তিনি যেন এই তরুণীটির প্রতীক্ষায় ছিলেন তাঁর জীবনে তিনি আসবেন বলে। ফলে তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের মাত্র দুমাসের মধ্যে গোপনে তাঁরা উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যদিও তাঁরা বুঝেছিলেন যে, সিদ্ধান্তটি তেমন বুদ্ধিমত্তা বা বাস্তববোধের পরিচায়ক হয়নি। প্রেমিকাটির সামাজিক সম্মান ছিল, কিন্তু অর্থ ছিল না। ফ্রয়েডের এই দুটির কোনোটিই ছিল না। নিঃসন্দেহে তিনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তার বাইরে আর কিছুই তিনি তখনও অর্জন করতে পারেননি। না সম্ভাবনাপূর্ণ অসামান্য কোন পদ, না বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্মের জন্য তেমন কোন খ্যাতি-প্রতিপত্তি! নিজের বৃদ্ধ পিতার কাছ থেকেও তাঁর পাওয়ার কিছু ছিল না কেননা তাঁর নিজেরই আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। ফলে ফ্রয়েড মনে মনে যা ভাবছিলেন তা-ই সোচ্চারে প্রকাশিত হয়েছিল ব্রুকের মুখে। ফ্রয়েড এর জন্য চাকরিতে যোগদান করার পরিস্থিতিটি এভাবেই তৈরি হয়েছিল এবং চিকিৎসক হিসেবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা ব্যতীত তখন মধ্যবিত্ত মাপের একটি পরিবার প্রতিষ্ঠা করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ রোজগারের অন্য কোন উপায় ছিল না। ফ্রয়েড প্রেমিকার সঙ্গে পরিণয়বন্ধনকে যত শীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়িত করতে চাইলেন। ভিয়েনাতে সাক্ষাতের

পর মার্থা-কে তাঁর উত্তর জার্মানীর বাড়িতে ফিরে যেতে হয়। এরপর দীর্ঘ চার বছর ধরে উভয়ের মাঝে মাঝে দেখা হলেও তা হত অল্পদিনের জন্য। তবে প্রায় প্রতিদিন তাঁদের মধ্যে পত্র বিনিময় চলত। এভাবে উভয়ে তাঁরা নিজেদের অসাক্ষাৎজনিত কষ্ট লাঘব করতেন পত্রালাপের মাধ্যমে। এই সময়কালে ফ্রয়েড চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেন এবং বিশেষত নিউরোঅ্যানাটমি ও নিউরোপ্যাথোলজি (Neuroanatomy ও Neuropathology) বিষয়ক চর্চায় মনোযোগী হন। অতঃপর ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ভিয়েনাতে প্র্যাকটিস শুরু করার পাঁচ মাস পরে প্রেমিকার পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের জন্য প্রাপ্ত উপহার ও অর্থ, ধনী বন্ধুদের দেওয়া দামী উপহারসামগ্রী ও ঋণ দেওয়ার ছল করে দেওয়া অর্থসহায়তা এবং ফ্রয়েডের নিজের অনেক পরিশ্রম ও যত্নে অর্জিত অর্থসঞ্চয় তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে ঘর গড়ে তোলার স্বপ্নপূরণে সহায়ক হল। বিয়ের একবছর পর সেই ঘরে জন্ম নিল প্রথম যে কন্যা শিশুটি জন্মদাতা নিজের একজন ভাল বন্ধুর নামে তার নাম রাখলেন Mathilde। তিনি কদিন পরেই উচ্ছ্বসিত আবেগে লক্ষ করলেন যে, কন্যাটি তাঁর মতো দেখতে হয়েছে এবং তা দেখে তিনি বিস্ময়াভিভূত হলেন। এরপর বিয়ের নয় বছরের মধ্যে তিনি ছয়টি সন্তানের পিতা হলেন। তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হলেন Anna Freud যিনি বড় হয়ে তাঁর পিতার অতি নিকটজন, সেক্রেটারি, নার্স, শিষ্য এবং প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। নিজের জীবনেও তিনি প্রখ্যাত মনঃসমীক্ষক (Psycho-anlyst) হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিয়ের পর পাঁচটি বছর ফ্রয়েড কিভাবে কাটিয়েছিলেন সে সম্পর্কে লিখেছেন, "During the period from 1886 to 1891 I did little scientific work, and published scarcely anything. I was occupied with establishing myself in my new profession and with assuring my own material existence as well as that of a rapidly increasing family."[৬] বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গবেষণামূলক সৃজনশীল কর্মে নিবেদিতপ্রাণ ফ্রয়েড-কে বিয়ে করার জন্য এবং বিয়ে করার পরও নতুন চিকিৎসা পেশা এবং দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া পরিবার নিয়ে, যথেষ্ট বিড়ম্বনা পোহাতে হয়েছিল। ব্যবহারিক জীবনে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই-এ জগদ্বিখ্যাত এই মানুষটিকেও সামিল হতে হয়েছিল আর পাঁচজন সাধারণের মতোই। তাঁরও রেহাই মেলেনি! তবে অসাধারণ এই ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর উদ্ভাবনী প্রতিভার স্ফূরণ তাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত, অভূতপূর্ব আবিষ্কার-কর্ম সাধনে ব্যয় করেছিলেন।

১৮৮৫ থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, বিয়ের আগে ফ্রয়েড প্রখ্যাত ফরাসী নিউরোলজিস্ট জাঁ মার্টিন শার্কো (Jean-Martin Charcot)-এর সঙ্গে প্যারিস কাজ করেন। শার্কো তখন হিস্টিরিয়া ব্যাধি ও হিপনোটিজম পদ্ধতি সম্পর্কে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিমগ্ন। তিনি হিস্টিরিয়াকে একধরনের নার্ভ-সংক্রান্ত অসুখ বলে সিদ্ধান্ত করলেন। ফ্রয়েড তাঁর অধীনে কাজ করতে করতে আবিষ্কার করলেন যে, এটি আসলে একপ্রকার মানসিক ব্যাধি, কোনপ্রকার দৈহিক অসুখ নয়। তিনি এই রোগ থেকে মুক্তির উপায়ও নির্দেশ করে দিলেন। হিস্টিরিয়াকে এর আগে মেয়েদের ব্যাধি বলেই মনে করা

হত। কিন্তু শার্কো প্রমাণ করে দেন যে, অসুখটি পুরুষদেরও হতে পারে। তাঁর সঙ্গে কাজ করাকালীন সময়ে ফ্রয়েড মানসিক রোগ সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং বলা যায়, মন সম্পর্কিত গবেষণাকর্মে তখনই প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মনঃসমীক্ষক হিসেবে ভবিষ্যত জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর, তাঁর বহুল কর্মময় জীবনে, এভাবে প্যারিসেই স্থাপিত হয়েছিল।

তিনি ১৮৮৬-তেই ভিয়েনায় ফিরে বিয়ে করেন এবং স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ শুরু করেন ও এই ব্যাধি সম্পর্কে তিনি গবেষণাকর্মও সম্পাদন করতে থাকেন। তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হতে থাকে। ক্রমে তিনি হিস্টিরিয়া ব্যাধি ও হিপনোসিস পদ্ধতির সাহায্যে তার নিরাময় সংক্রান্ত গবেষণাকর্মে অধিক আগ্রহী হয়ে পড়েন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের ন্যান্সি স্কুলের চিকিৎসকরা এই ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টায় বহুলাংশে সাফল্য অর্জন করেছেন জেনে তিনি সেখানে ছুটে গেলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, তাঁরাও তাঁরই মতো একই ধরনের অসুবিধা বোধ করছেন এই ব্যাধি নিরাময় করার ক্ষেত্রে। ফিরে এলেন, তবে নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে তিনি হিপনোটিজম-এর অভিনব ব্যবহার-কৌশল আবিষ্কার করে ফেললেন। এ ব্যাপারে যাঁদের নিবিড় বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা তিনি পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন নাক ও গলা বিশেষজ্ঞ বার্লিনের উইলহেল্ম ফ্লীস (Wilhelm Fliess) এবং অপরজন হলেন তাঁর পিতৃতুল্য বন্ধু, ভিয়েনার একজন পারিবারিক চিকিৎসক, জোসেফ ব্রয়ার (Joseph Breuer)। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রয়েড (Freud) ও ব্রয়ার (Breuer) একসঙ্গে."Studies on Hysteria" নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁরা এ বিষয়ে একসঙ্গে প্রবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন। ব্রয়ার মূলত তাঁর অসম্ভব রকমের পেশাগত ব্যস্ততার জন্য এবং আনুষঙ্গিক বিশেষ কারণবশত এই বিষয়ে গবেষণায় আর অগ্রসর হননি। কিন্তু ফ্রয়েড নিরন্তর পরীক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে থাকেন এবং মানুষের মন সম্পর্কিত সমস্যাদি সম্পর্কে গভীরতর অনুসন্ধান ও গবেষণাকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং ক্রমে তাঁর মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) বিষয়ক ভাবনাদি বিজ্ঞানের জগতে প্রসার ও স্বীকৃতি লাভ করে।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর নিজের একটি স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হলেন যে ব্যাখ্যা চার বছর পরে তাঁর "Interpretation of Dreams" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তিনি ক্রমান্বয়ে মনোজগতের ঘটনাগুলির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে থাকলেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনিই প্রথম "Psycho-analysis" শব্দটি ব্যবহার করেন। এই একই বছরে তিনি তাঁর পিতাকে হারালেন। বারো বছর পরে তিনি তাঁর পিতৃবিয়োগ সম্পর্কে বলেন, "the most poignant loss of a man's life".[৭] এই ঘটনা তাঁর মনঃসমীক্ষক সত্তায় প্রভাব ফেলে। পরবর্তী তিন অথবা চারবছর ধরে তাঁর গবেষণাকর্মে নতুন আবিষ্কারসমূহ ঠাঁই করে নেয়। নতুন নতুন চিন্তাধারা তাঁর মনোজগতে আলোড়ন তুলে মানবমনের ক্রিয়াসমূহের ব্যাখ্যা হিসেবে বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া ফেলে দেয়। মানসিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে যৌনক্রিয়ার সম্পর্ক বিষয়ক অজানা সব তত্ত্ব, ঈডিপাস কমপ্লেক্স নামক তত্ত্বের আবিষ্কার তাঁকে এনে

দিল একই সঙ্গে খ্যাতি ও দুর্নাম দুই-ই।

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর "Interpretation of Dreams" প্রকাশিত হয় যাতে তিনি বলেন, স্বপ্নমাত্রই ইচ্ছাপূরণ ভিন্ন কিছু নয় এবং মনবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ একটি তত্ত্ব তিনি এই গ্রন্থে উপস্থাপন করলেন। গ্রন্থটি সমাদৃত হয়নি। কিন্তু ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "Psychopathology of Everyday Life" বিপুল খ্যাতি এনে দিল। ধীরে ধীরে তিনি সম্মান ও সমর্থক পেতে শুরু করলেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভিয়েনার কিছু চিকিৎসকদের নিয়ে ভিয়েনা সাইকোএ্যানালিটিক সোসাইটি (Vienna Psychoanalytic Society) গড়ে তোলেন। ১৯০৯ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি মনঃসমীক্ষণ বিষয়ক চিন্তাভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুললেন। তিনি এসবের বাইরে ধর্ম, সাহিত্য, যৌনতা, জীবনী, ভাস্কর্য, প্রাগৈতিহাসিক ঘটনাবলী এবং আরও বিবিধ বিষয়েও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সময়ে মনঃসমীক্ষণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লেও ফ্রয়েডের তত্ত্বে যৌনতার প্রাধান্য লক্ষ্য করে নানাপ্রকার বাধাও আসতে থাকে এর প্রচারের ক্ষেত্রে। মানুষের সমস্ত আচরণের মূলে কোন না কোন যৌন ক্রিয়া সম্পৃক্ত থাকে এবং শিশুরাও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়—এই প্রকার মতবাদ তাঁর নিন্দুক ও বিরোধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। মূলত দীর্ঘকালব্যাপী লালিত সংস্কার ফ্রয়েডের তত্ত্বকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল তাঁর অনুরাগী পাঠক মহলেও। এমন কি তাঁর দুজন অতি ঘনিষ্ঠ শিষ্যও তাঁর বিরোধিতা করলেন। তাঁর হলেন অ্যালফ্রেড অ্যাডলার (Alfred Adler) এবং কার্ল জি. ইয়ুং (Carl G. Jung)। উভয়েই তাঁরা ফ্রয়েডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তাঁর তত্ত্বের যৌনসর্বস্বতাকে মেনে নিতে না পেরেই। ফ্রয়েড এই প্রকার বিচ্ছেদে খুবই ব্যথিত হয়েছেন কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে একপাও সরে দাঁড়াননি। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মনঃসমীক্ষণের পূর্ব ইতিহাস লিখলেন "Totem and Taboo" গ্রন্থে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন, "The Moses of Michelangelo"। একই বছরে Narcissism বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলেন। এর পর পরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল ইউরোপে। মনঃসমীক্ষণ-এর আন্তর্জাতিক প্রসার ক্ষতিগ্রস্ত হল কিন্তু ফ্রয়েড থেমে থাকলেন না। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল সাইকোএ্যানালিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশান (International Psychoanalytical Association) যুদ্ধের পর ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দেও টিকে রইল। যুদ্ধে বিবদমান দুই পক্ষই মনঃসমীক্ষণকে যুদ্ধাবসান ঘটানোর কাজে ব্যবহার করা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। যাহোক মনঃসমীক্ষণ বিলুপ্ত হয়নি। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে ফ্রয়েডের জন্য ভিন্নতর দুর্ভাবনার কারণ ঘটেছিল। তাঁর তিনজন পুত্রসন্তানই আর্মিতে ছিলেন যাদের মধ্যে দুজনকে প্রতিদিনই মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়ে লড়তে হত। তথাপি সেই ভয়াবহ যুদ্ধও ফ্রয়েড-এর মনকে নিষ্ক্রিয়, অলস করে তুলতে পারেনি। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি Metapsychology বিষয়ে এক ডজন মৌলিক প্রবন্ধ লিখে ফেলেন যেগুলির মধ্যে থেকে ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সময়কালে তিনি পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং বাকিগুলি নষ্ট

করে ফেলেন। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম মনঃসমীক্ষকরা জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি থেকে এসে বুডাপেস্ট-এ মিলিত হন। এর দুমাস পরে যুদ্ধ থেমে যায়। ফ্রয়েড-এর পুত্রসন্তানরা তিনজনেই বেঁচে ফিরে আসেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভিয়েনাতে দেখা দিল খাদ্য ও জ্বালানির অভাব এবং যক্ষ্মা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটল যত্র তত্র। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রয়েডের পারিবারিক জীবনে যুদ্ধ পরবর্তীকালে নেমে এল মর্মান্তিক আঘাত। তাঁর প্রিয় দ্বিতীয় কন্যা সোফি, দুটি শিশুর জননী, ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

ইত্যবসরে ফ্রয়েডের নাম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। মনঃসমীক্ষণ বিষয়ক আন্দোলন প্রসার লাভ করল। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধপরবর্তী মনঃসমীক্ষণ বিষয়ক কংগ্রেসে ফ্রয়েডের পূর্ব শত্রুরা অনেকেই তাঁর মিত্র হিসেবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মনঃসমীক্ষকরা বার্লিনে সম্মেলন করলেন যেটিতে ফ্রয়েড অংশগ্রহণ করেন এবং সেটি ছিল তাঁর জীবনের শেষ কংগ্রেস। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে ধরা পড়ল যে, তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসকগণ ও শুভানুধ্যায়ীরা কয়েকমাস ধরে এই সত্যটি তাঁর কাছে গোপন রাখেন। তারপর বড়সড় রকমের অস্ত্রোপচার করা হল। কিন্তু তার পর থেকে যন্ত্রণা ও অস্বস্তি তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে গেল।

এত বিপর্যয় সত্ত্বেও ফ্রয়েডের কর্মজীবন কখনও থেমে থাকেনি। তিনি গবেষণাকর্ম বন্ধ করেননি। তিনি লিখে চললেন, *Inhibitions, Symptoms and Anxiety* (1926), *The Future of an Illusion* (1927), *Civilization and its Discontents* (1930), ১৯৩০-এ তিনি মাকে হারালেন, সেই বছরই তিনি গোয়টে পুরস্কার (Goethe Award) লাভ করেন। ১৯৩৩-এ হিটলার জার্মানি অধিকার করলেন এবং বার্লিনে প্রকাশ্য স্থানে ফ্রয়েড-এর সমস্ত পুস্তকাদি পুড়িয়ে ফেলতে হুকুম দিলেন। তবুও তাঁর খ্যাতি আটকানো যায়নি। সারা পৃথিবীতে তাঁর স্বীকৃতি ও খ্যাতি প্রসার লাভ করে। ১৯৩৬-এ তিনি দি রয়্যাল সোসাইটি (The Royal Society)-র সদস্যপদ পান যখন তিনি আশি বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন। এই সময়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সকলে চলে গেলেও তিনি একই সঙ্গে তাঁর ঘৃণা ও ভালবাসার ভিয়েনা ছাড়তে চাইছিলেন না। তিনি তখন অতি বৃদ্ধ, ১৯৩৮-এ হিটলার অস্ট্রিয়া আক্রমণ করলেন। তাঁর কন্যা Anna কে গেস্টাপো হেড কোয়ার্টারে তলব করা হল। তারপর যখন তাঁকে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হল Freud-এর সিদ্ধান্ত বদলে গেল। তিনি ভিয়েনা ছেড়ে প্যারিস গেলেন। পরিবারের অধিকাংশ সদস্যরা লন্ডনে যান। তিনিও সেখানে পালিয়ে গেলেন। তাঁর অমূল্য প্রাণটি রক্ষা হয়েছিল এভাবে কিন্তু নাৎসীরা তাঁর সমস্ত গ্রন্থ নষ্ট করে দেয়।

অসহনীয় বার্ধক্য ও মারাত্মক শারীরিক অসুস্থতাও ফ্রয়েড-কে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারেনি। সে অবস্থায় তিনি লিখলেন, *Moses and Monotheism*। তারপর *Outlines of Psychoanalysis* গ্রন্থটি লিখতে শুরু করেন লন্ডনে পৌঁছে, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। লেখা চলাকালে তাঁর দেহে বড় ধরনের অস্ত্রোপচার করতে হয় এবং তারপর

তিনি আর সে লেখায় হাত দিতে পারেন নি। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর ২৩ তারিখে তাঁর বিপুল কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর নিজের কথামতো, তিনি যেন স্বাধীনভাবে মৃত্যুবরণ করতেই ('to die in freedom') ইংল্যান্ডে এসেছিলেন এবং সেটি তিনি সম্ভব করেছিলেন অসম্ভব মনের জোরে। দৃঢ়চেতা ফ্রয়েড নিজেই তাঁর চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে দুরারোগ্য ব্যাধি এবং নিষ্ক্রিয় জীবনযাপনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের উপায় নির্ধারণ করেন। প্রিয় চিকিৎসক তাঁকে মরফিন ইনজেকশন দিয়ে গভীর মর্যাদাবোধ নিয়ে মরণকে বরণ করে নিতে সাহায্য করেন। তিনি বহু বছর আগে একসময় তেমন একটি অনাগত দিনের কথা ভেবে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, 'when thoughts fail or words will not come."[৮] তাঁর নিজের জীবনে তেমন দিন আসার সম্ভাবনা বুঝে নিয়ে তিনি জীবনযাত্রায় ইতি টেনে দিলেন স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে। এভাবে জীবনের অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং অত্যাশ্চর্য কর্মক্ষমতা দুটিই বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। একথার পূর্ণ সমর্থন মেলে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী বন্ধু হানস্ স্যাক্স-এর লেখায়। তিনি লিখেছেন, যখন ফ্রয়েড ব্যাধি ও বার্ধক্যজনিত অসহনীয় দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন জীবনের শেষ পর্যায়ে, তখন "আমি একবারও তাঁর মুখ থেকে নালিশ বা অভিযোগের একটি শব্দও শুনিনি, কোন যন্ত্রণাসূচক শব্দ বা কাতরোক্তিও কখনও তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়নি।"[৯]

ব্যক্তিজীবনের টুকরো ছবি

পরিবার-পরিমণ্ডল

ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন, একটিমাত্র অনুরাগ ও আগ্রহের বিষয়ে নিজের সমস্ত ধ্যান-ধারণা-কর্মসাধনাকে কেন্দ্রিত করা যায় এবং নিজের জীবনে তিনি সেই বিশ্বাসকেই রূপায়িত করেছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা সকলেই তাঁর এইপ্রকার জীবনাচরণ মেনে নিয়েছিলেন। ফ্রয়েডের একনিষ্ঠ বিজ্ঞান-সাধনা তাঁর পারিবারিক জীবনে অনেক সময়ই আর্থিক বিপর্যয় এনে দিয়েছে তথাপি তাঁর স্ত্রী কখনও তাঁর প্রতি বিরূপ হননি বা বিচলিতও হননি। তাঁর সন্তানরাও তাঁর প্রতি তাদের মায়ের মতোই শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বস্তুত তাঁর পরিবার তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। তবে তিনি নিজেও পরিবারের ভালমন্দের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তাঁর পরিবারের পরিমণ্ডলে সকলের মধ্যে শান্ত ও সহজ-সুন্দর সম্পর্ক বজায় ছিল এবং তাঁর স্ত্রীর ভূমিকা ছিল সেক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন একজন স্বভাব-মধুর এবং সহৃদয়া প্রকৃতির মহিলা যিনি পরিবারের ভৃত্যবর্গের সঙ্গেও আত্মীয়-সুলভ আচরণ করতেন।

প্রাত্যহিক দিনযাপন

প্রতিদিন সকাল নটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত রোগী দেখার পর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-আহার সারতেন এবং তারপর একঘণ্টা ধরে বইয়ের দোকান, সিগারেটের স্টোর্স, নাপিতের দোকান, পুরনো জিনিসের দোকান ইত্যাদিতে ঘুরে বেড়াতেন। তারপর

পূর্ব নির্ধারিত কনসালটেশন পর্ব চলত। সন্ধেবেলা রোগী দেখার নিয়মিত কাজ সেরে কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে একটু মজা করাও ছিল তাঁর কাজ। সন্ধের খাওয়া সারা হলে বুধবার ও শনিবার বাদে অন্যান্য দিন স্টুডিয়োতে কাটাতেন। বুধবার থাকত মনঃসমীক্ষণ সমিতির সভা, শনিবার বিকেলে বক্তৃতা তৈরি ও সন্ধেয় বক্তৃতা দেওয়ার পর তাসখেলা চলত। সপ্তাহে একদিন যতগুলি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন সেগুলিতে প্রকাশের জন্য আসা প্রবন্ধগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন। নিজে তিনি সমস্ত প্রবন্ধ পড়ে মতামত দিতেন। তারপর আড্ডার আসরও বাদ যেত না, সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়ে দিয়ে চলত সে আড্ডা। কোন সন্ধেয় তিনি একাই কর্মমগ্ন হতেন। অনেক রাত্রে শুতে যেতেন কিন্তু সকালে ঠিক সময়ে ওঠাতে কখনও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তিনি কখনও ক্যালেন্ডারের ছোট ছোট ছুটি কাজে লাগাতেন না। প্রত্যেক বছর জুনের শেষ থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত একটানা তিনমাস ছুটি নিয়ে তিনি কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় পরিবারের সঙ্গে কাটাতেন এবং তারপর বেড়ানোর জায়গা স্থির করে সেখানে থাকতেন কিছুদিন। এই সময়টিতে তিনি লেখার কাজে বাধাবিহীন অবকাশ পেতেন। তিনিও সেটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার প্রতি মনোযোগী হতেন। তবে লেখার জন্য তাঁর কাঙ্ক্ষিত অবসরের আবশ্যকতা কখনও হয়নি, বহু জটিল বিষয়ক লেখা তিনি অতিব্যস্ত সময় কাটানোর মধ্যেও লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং তাঁর লেখার মানে তাতে বিন্দুমাত্র ঘাটতি ঘটত না।

বক্তৃতা-বৈশিষ্ট্য

ফ্রয়েড বক্তৃতা দেওয়ার সময় জোরে কথা বলে কণ্ঠযন্ত্রকে কষ্ট দিতে পছন্দ করতেন না। ফলে বড় সভাগৃহে বক্তৃতা দেওয়া তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি কেবল মনঃসমীক্ষণ সমিতির সভা ও অধিবেশনে বক্তৃতা দিতেন নির্ভুল পরিবেশন-কৌশল অবলম্বন করে ও সুন্দর উচ্চারণে। তিনি কখনও তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলতেন না। বক্তব্য প্রকাশের বিশেষ আঙ্গিক লক্ষণীয় ছিল তাঁর বক্তৃতায়। বিরাট তত্ত্বকেও তিনি সহজ-স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে সহজবোধ্য করে তুলতেন। তাতে থাকত না বিদ্যাপ্রকাশে বাহাদুরি দেখানোর ঝোঁক বা ভাষাগত দুর্বোধ্যতা। তিনি অসাধারণ বক্তব্য-বিষয় অতি সাধারণ শব্দ ব্যবহার দ্বারা শ্রোতাদের বোধগম্য করে তুলতেন।

তিনি তাঁর বক্তৃতায় এক অভিনব পদ্ধতিতে শ্রোতাদের কোনো বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্ররোচিত করতেন যেটির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতবাদ তাঁরা বক্তৃতা শোনার পূর্ব পর্যন্ত পোষণ করতেন। তাঁদের অগোচরেই তিনি সেটি সম্ভব করে তুলতেন। প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করে, স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকৃত কিছু নীতিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি নিজের মতটি উপস্থাপন করতেন দৃঢ় যুক্তি সহকারে। তারপর সম্ভাব্য বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা করে সেগুলি খণ্ডন করতেন। শ্রোতারা তখন তাঁদের নিজেদের অজান্তেই তাঁর মতবাদকে সম্মোহিতের মতো মেনে নিতেন এবং অবাক হয়ে খেয়াল করতেন যে, তাঁরা সেই মতটির বিরোধিতাই করে এসেছেন এতকাল। ন্যায়দর্শনে এইপ্রকার পদ্ধতির ব্যবহার

ভারতীয় দার্শনিকরা করেছিলেন যার নাম 'তর্ক'। ফ্রয়েড বস্তুত 'তর্ক' পদ্ধতির মতো বিশেষ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বক্তা হিসেবে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং অভিনব বক্তৃতা-রীতি প্রণয়নে দক্ষতার পরিচয় দেন।

পড়াশুনার পরিধি

ফ্রয়েড মানুষের মন জানতে যতখানি আগ্রহী হয়েছিলেন বই-পাঠ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ তার থেকে কিছুমাত্র কম ছিল না। বিশ্বসাহিত্যের সকল শ্রেষ্ঠ বই-ই তিনি পড়ে ফেলেছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনার তিনি পাঠক ছিলেন। তিনি ভাষা বিষয়ে বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। মাতৃভাষা ব্যতীত ইংরেজি, ফরাসি, ইতালীয়, স্প্যানিশ, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষা তিনি শিখেছিলেন এবং সেগুলিতে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রিয় লেখকদের মধ্যে আনাতোলে ফ্রাঁসের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কবি হাইনের রচনাবলীর অনুরাগী পাঠক ছিলেন। সেক্সপীয়র তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন কেননা তিনি তাঁর মধ্যে 'মনঃসমীক্ষণের উর্বরা চারণভূমির সন্ধান' পেয়েছিলেন। দস্তয়েভস্কির সাহিত্যকৃতির প্রতিও তিনি যথেষ্ট প্রশংসার মনোভাব পোষণ করতেন।

মন-পাঠে ব্যর্থতা

ফ্রয়েড-এর জীবনের একটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতা অনেকেরই হতাশার কারণ হয়েছিল—বিশেষত, তাঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের। তিনি প্রায়ই বলতেন—

"আমি তো মানুষের মন পড়তে পারি না।" এমন স্বীকারোক্তির মূলে ছিল তাঁর জীবনে বারংবার ঘটেছে এমন কিছু ঘটনা। তিনি অ্যাডলারকে নিজের উত্তরাধিকারী মনে করে ভুল করেন। এই ঘটনার পর আবারও তিনি য়ুঙ্গকে আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষণ সমিতির সভাপতি মনোনীত করে ভুল করেন। দুজনেই তাঁর গভীর মনোবেদনার কারণ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করা মানুষজনদের স্বভাব-বিচারে ক্রমাগত ভুল করেছেন, কেননা তিনি তাঁদের মধ্যে মহৎ গুণ ও প্রতিভা যতটুকু দেখতে পেতেন তার থেকে অনেক বেশি করে ভেবে নিতেন আর তার ফলেই তাঁর মূল্যায়নে ভ্রান্তি ঘটে যেত। কিন্তু মনঃসমীক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতির সঙ্গে মানুষের মন-পাঠে তাঁর এই প্রকারের ব্যর্থতা বড়ই বেমানন ঠেকত পরিচিতজনেদের কাছে। তবু তিনি এমন ব্যক্তিত্বই ছিলেন যিনি কাছের জনদের 'সমগ্র ব্যক্তিত্বকে সাধারণ স্তরের অনেক উর্ধ্বে স্থাপন করতেন এবং সেকারণেই তাঁর মনঃসমীক্ষক জীবন-বৃত্তেই ঘটত এমন আপাত অসঙ্গতি-প্রকাশক ব্যর্থতা।

উপসংহার

ফ্রয়েড আসলে অনির্বচনীয় বিস্ময়-এরই একটি নাম। মানুষ যেসকল উপায়ে সুখ পাওয়ার চেষ্টা করে সেগুলির কোনটির দ্বারাই সুখ পাওয়া সম্ভব নয়—এই সত্যকে জেনে এবং মেনেও কেন যে তিনি আমৃত্যু নিরন্তর কর্ম-সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন বোঝা কঠিন। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন ওঠে, "অসুস্থতা, যন্ত্রণা এবং অশেষ ক্লান্তির মধ্যেও,

মৃত্যুর ছায়া একেবারে সামনে দেখেও যখন কোনও প্রাপ্তির কোনও আশা ছিল না—তখনও তাঁর অক্লান্ত কর্মোদ্যম কীসের দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিল?"[১০]

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের জানা নেই। তাই ফ্রয়েড-এর কথাতেই উত্তর দেওয়া যাক—"Looking back, then, over the patchwork of my life's colours, I can say that, I have made many beginnings and thrown out many suggestions. Something will come of them in the future, though I cannot myself tell whether it will be much or little. I can, however, express a hope that I have opened up a pathway for an important advance in our knowledge.[১১]

তাঁর সেই আশা, আমরা মানতে বাধ্য যে, বিফল হয়নি।

উদ্ধৃতি সূত্র

১. Peter Gay, 1989; Freud : A Life for Our Time, United States of America, Pgs xv-xvi.
২. Sigmund Freud : An Autobiographical Study, United States of America, 1989; Pg. 6.
৩. ঐ, Pg. 8
৪. ঐ, Pg. 8
৫. Peter Gay, Freud : A life for our Time; Pg. 33.
৬. Sigmund Freud : An Autobiographical Study; Pg. 17.
৭. ঐ, Pg. xiii
৮. Peter Gay, Freud : A Life for Our Time; Pg. 651.
৯. ফ্রয়েড : শিক্ষক ও বন্ধু, হানস্ স্যাক্স; অনুবাদ ঃ পুষ্পা মিশ্র, গাঙচিল, ২০১১; পৃ. ১৪৩
১০. ঐ, পৃ. ১১৬
১১. Sigmund Freud : An Autobiographical Study, Pg. 80

সহায়ক গ্রন্থ

১. Peter Gay, Freud : A Life for Our Time.
২. Richard Wollheim, Freud; Glasgow, 1974
৩. Sigmund Freud : An Autobiographical Study
৪. সিগমুণ্ড ফ্রয়েড—মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০০০৯, ২০০১
৫. ফ্রয়েড : শিক্ষক ও বন্ধু, পুষ্পা মিশ্র (অনুবাদ), হানস স্যাক্স।